না – রিয়াক্টার দু'টোকে ডাউন করে দিল। ইউনিয়নও কোনও বাধা দিতে পারল না। অনেকটা তেতো ওষুধ গেলার মতো করেই ব্যবস্থাটাকে মেনে নিল।

আর এরই ঠিক দু'দিন পরে নর্থ এলিভেটারের ওপরে স্যাম্পেল চেক করতে গিয়ে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের একজন শিফ্‌ট ইঞ্জিনিয়ার প্রায় সাত তলা উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারাল। সারা কারখানাটাই এবারে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন আশিস ঘোষও, চূড়ান্ত হতাশায় ডুবে গেলেন। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন না – বরং ডিপার্টমেন্টের সব ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চাকরি থেকে রিজাইন করে মজিদপুর ছেড়ে চলে গেলেন।

... ...

'তোমার আজকাল কী হয়েছে বল তো?' আলো সেন জানতে চাইলেন। 'কোনও কিছুতেই মন দাও না – সারাক্ষণ কী যেন ভাব। সব কিছুতেই কেমন যেন গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব। যেন করতে হয় তাই করছ। কী ব্যাপার, আজকাল কি আমাকে আর পছন্দ হয় না – নাকি প্রেমে পড়েছ?'

'হুঁ।' অর্ক উত্তর দিল। জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলল।

'কিসের কী হুঁ?' আলো সেন জিজ্ঞাসা করলেন। রমণ তৃপ্ত ঠোঁটদু'টোকে রোঁয়া ফোলা আদুরে বেড়ালের মতো ফুলিয়ে তুললেন। ভালো লাগার চূড়ান্ত আবেশে অর্ককে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। রং পলাশের মতো রোশনাই ছড়িয়ে চূড়ান্ত সীমারেখা স্পর্শ করে হঠাৎ যেন অবশ হয়ে পড়লেন। তারপর সুখানুভূতিকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করে একটা ফাজলামি মার্কা হাসি হেসে উঠলেন। চোখদু'টোকে অপূর্ব ভঙ্গিকে মটকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, 'তা প্রেমের আর দোষ কী – যা একখানা চেহারা বানিয়েছ না – ঠিক যেন মিকালেঞ্জোর আঁকা পুরুষ মূর্তি। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এই বয়সে আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছা হয়!

তা প্রেমে পড়লটা কে – তুমি না সেই মেয়েটা?'

'আমি।'

'আর সেই মেয়েটা?'

'জানি না, বোধহয় পড়েনি।'

'ওমা সেকি – কেন?' আলো সেন বললেন, যেন খুব অবাক হলেন। মায়াবি চোখদু'টোকে আরও মায়াবি করে তাকালেন। 'তবে আমাকে ওর কাছে নিয়ে চল, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু আমাকে আবার নিয়ে যাবে তো – নাকি ওকে পেয়ে আমাকে আর চিনতেই পারবে না, ভুলে যাবে?'

'না, ভুলব না – নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবে – বাঃ! তা কবে নিয়ে যাবে?' আলো সেন বলে উঠলেন। অনেক চেষ্টা করে হতাশ গলাটাকে যেন খুশি খুশি করে তুলেলন। অর্ক কাউকে ভালোবাসে জেনে মনোক্ষুণ্ণতার আবেগটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে ওকেই যেন শক্ত করে চেপে ধরলেন।

'আজই নিয়ে যাব।' অর্ক বলল।

'তাই, আজই নিয়ে যাবে – কখন নিয়ে যাবে?'

'তুমি চাইলে এখনই নিয়ে যাব। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে তো বিছানা থেকে নামতে হবে – বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

'তার মানে, আয়নাটার সামনে দাঁড়াতে হবে কেন? কী বলছ কী তুমি, কিছুই তো মানে বুঝি না!'

'সে তো আমিও বুঝি না, তবু বলি – সত্যি বলেই বলি। নারী দেহ আমার কাছে নতুন কিছু নয়, খুব অল্প বয়েস থেকেই আমি তার সঙ্গে পরিচিত। চুম্বকের মতো সে আমায় আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ যে কতটা তীব্র, তুমি নারী, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবু এখন মনে হচ্ছে থাক, অনেক হয়েছে। দেহ ছেড়ে এবারে একটু মনের দিকেই নজর দেওয়া যাক।

একটু আগেই তুমি বলছিলে না – আমি আজকাল যেন পাল্টে গিয়েছি। সত্যিই তাই, ইদানীং আমি যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছি – কিন্তু কেন হয়েছি তা নিজেই জানি না।

আজকাল কোনও মেয়ের দিকে তাকাতে পারি না। তাকালেই তাকে নয় শুধু তোমাকে দেখতে পাই। তোমার চোখদু'টো দেখতে পাই – তোমার ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করি – গলাও শুনতে পাই। কিন্তু কিছুতেই তোমার নগ্ন চেহারাটা চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলতে পারি না। অথচ সেটা তো আমার অপরিচিত নয়। বরং অতি পরিচিত।

আমি তাই অনেক ভেবেছি, নিজের মনের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। একা একা চিন্তাও করেছি। শেষে বুঝতেও পেরেছি। বুঝতে পেরেছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আলো – খুব ভালোবাসি।'

'তার মানে?' আলো সেন বললেন। কথাটা শোনামাত্রই যেন চিৎকার করে উঠলেন। কিছুক্ষণ হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎই অর্ককে ছেড়ে দিয়ে এক ঝটকায় উঠে বসলেন। খুব তাড়াতাড়ি একটা চাদর নিয়ে নিজের নগ্ন দেহটাকে ঢেকে নিলেন। বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলেন, 'তুমি কি পাগল, এ সব কী বলছ কী তুমি? এই পাগলামির মানে জানো?'

'জানি সব জানি। আর জানি বলেই তো বলছি।'

'কিন্তু আমি তো ভালো নই অর্ক, আমার যে অনেক পাপ। আমি যে নোংরা – সে তো তুমি জানই।'

'সে তো আমিও – আমারও পাপ আছে। তবে পাপপুণ্যের বিচারটা করে কে?'

'কে আবার করে – সমাজের মাথারা করে, বড় মানুষেরা করে। তা ছাড়া আমি তো বিবাহিত – একজনের মা। তোমার চেয়ে বয়সেও অনেক বড়। তা হলে?'

অঙ্কন ঃ অভি

'তোমার আজকাল কী হয়েছে বল তো?' আলো সেন জানতে চাইলেন। 'কোনও কিছুতেই মন দাও না – সারাক্ষণ কী যেন ভাব। সব কিছুতেই কেমন যেন গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব। যেন করতে হয় তাই করছ। কী ব্যাপার, আজকাল কি আমাকে আর পছন্দ হয় না – নাকি প্রেমে পড়েছ?' 'হুঁ।' অর্ক উত্তর দিল। জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলল

রসেবশে

একটা গল্প লিখব ভাবছি

লিপি চক্রবর্তী

ক্রিইংংং ক্রিইংংং

হ্যালো...

অস্মিতা, তোমার ফোন আছে। রিসেপশনিস্ট জোর গলায় ডাক দিলেন।

হ্যালো...

– আচ্ছা, আমি শালিকমারি থেকে বলছি। আমার কবিতাটা কি পেয়েছেন?

– কে বলছেন? আপনার নামটা বলুন।

– নাম দিয়ে কী হবে? কবিতাটা পেলেন কিনা জানতে চাইছি।

– আপনার নাম না বললে কী করে বলব পেয়েছি কিনা।

–কবিতার নাম 'আপনার নামটা জানতে চাই'।

– কীসে পাঠিয়েছেন? মেল–এ নাকি পোস্ট–এ?

– মেল করেছিলাম।

– মেল আইডি টা বলুন তবে। খুঁজতে হবে তো।

– আরে কবিতার নামটা বলছি। খুঁজে বার করতে পারছেন না?

এবার অস্মিতা স্পষ্টতই বিরক্ত। কিন্তু খদ্দের 'লক্ষ্মী', মানে এখানে লেখক লক্ষ্মী আর কি। রাগ করা যাবে না। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। কী লোক রে বাবা! নামও বলছে না!

– ম্যাডাম আপনি একটু দেখে বলবেন প্লিজ?

এবার অস্মিতা একেবারে ফেটে পড়ল রাগে। – আপনার নামটা না বললে খুঁজে বের করা যাবে না। বলে রিসিভারটা রিসেপশনিস্ট শিউলিদির হাতে দিয়ে চলে এল।

এরকমই হয়। রোজ একটা না একটা ঘটনা ঘটতেই থাকে। খবরের কাগজের অফিস। লেখা আসবে। পিছে পিছে লেখকও আসবেন। লেখা পছন্দ না হলে লেখকের অভিযোগ 'আপনি লেখার কিছুই বোঝেন না' বলে। কেউ আবার এককদম এগিয়ে বিভাগীয় প্রধানকে চিঠি লেখেন 'আপনার এই লোকটিকে চা আনার কাজে লাগান'। এ সবে অস্মিতা অভ্যস্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে মেজাজ হারায় বইকী। এই যেমন সেদিন। অস্মিতা সাত তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছেছিল বিকেলে এক বন্ধুর গানের অনুষ্ঠানে যাবে বলে। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে তো! এই সময় ফোন। শিউলিদিও আসেনি। তাই ফোনটা ধরল ও।

–হ্যালো...

–আচ্ছা আপনাদের কাগজে গল্প পাঠানো যাবে?

–হ্যাঁ অবশ্যই।

–আচ্ছা কত শব্দের মধ্যে দেওয়া যাবে?

শব্দ সংখ্যা বলল অস্মিতা। শুনে সেই ভদ্রলোকের প্রশ্ন– আপনারা লেখকদের সম্মান দক্ষিণা দেন?

–অবশ্যই দেওয়া হয়।

–কত দিনের মধ্যে পাওয়া যায়?

–এটা তো নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। মোটামুটি ছয় মাসের মধ্যে।

–আচ্ছা লেখা পাঠানোর কতদিনের মধ্যে ছাপা হয়?

–লেখা তো আগে মনোনীত হতে হবে। আচ্ছা আপনি কবে লেখাটা পাঠিয়েছেন?

ভদ্রলোকের লাজুক কণ্ঠে উত্তর, আসলে একটা গল্প লিখব অনেকদিন ধরেই ভাবছি।

ফোনটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখেছিল অস্মিতা।

আর একবার তো মস্ত কাণ্ড। চাকরিটা প্রায় যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। অফিসে ঢুকতেই শিউলিদি বলল, তোমাকে ঘোষদা দেখা করতে বলেছেন। বোসদা আর্থাৎ বিভাগীয় প্রধান। রাশভারী মানুষ, তেমনি চাঁছাছোলা কথা। আর দেখা করা মানেই তো ঝাড় আছে কপালে। সহকর্মীদের মুখ লুকিয়ে হাসি বোঝাই যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তা নিয়েই ঘোষদার ঘরে ঢুকল অস্মিতা। সঙ্গে সঙ্গে ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই... এলোপাথাড়ি কথার বুলেট ছুটতে শুরু করল ঘোষদার। প্রায় মিনিট দশেক পরে উত্তর দেওয়ার সুযোগ হল অস্মিতার। ঘটনাটা হয়েছে কী, এক গল্প লেখিকার একটি গল্প ভুল করে দু'বার ছাপা হয়ে গিয়েছিল তিন মাসের ব্যবধানে। তখন তিনি ছেলের কাছে বিদেশে গিয়েছিলেন। তাই নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর কোনও আত্মীয় কাগজটি কিনে রেখে গৌরব বোধ করেননি বোধহয়। কিন্তু খবরটা তাঁকে কেউ সাপ্লাই করেছিল। তাই পত্রিকার দপ্তরে তিনি ফোন করেছিলেন গল্পটি আরও একবার ছাপতে। তিনি এক রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতার মেয়ে। অস্মিতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে লেখাটা আর ছাপা যাবে না। ওই মহিলা তখন সরাসরি বিভাগীয় প্রধানের কাছে নালিশ করেছেন, যে গল্পটা এত ভালো, দু'বার করে ছাপা হল আর সেই গল্পটা আরও একবার কেন ছাপাতে আপত্তি জানাল একজন সাধারণ কর্মী।

বিভাগীয় প্রধানের রাগ, আগেই দু'বার একই গল্প ছাপিয়ে নিয়মভঙ্গ করায় নাকি প্রভাবশালী নেতার মেয়ের অনুরোধ না রাখায়– সেটা আজও অস্মিতা জানতে পারেনি। চাকরিটা অবশ্য যায়নি আর গল্পটাও তৃতীয়বার ছাপা হয়নি।

একজন তো আবার শিবঠাকুরের মানহানি করার চেষ্টা করেছিলেন অস্মিতার সাহায্যে। পুজোর সময় একটা কভার স্টোরি লিখে নিজের হাতে দপ্তরে পৌঁছোতে এসেছিলেন তিনি। বিষয়– মা দুর্গা এবং ৪৯৮এ ধারা। শিবঠাকুর কীভাবে অত্যাচার করেন মায়ের উপর যে মায়ের চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসেও শান্তি নেই। সেটাই সবিস্তারে বর্ণনা করে লিখেছেন কেন এই সময়ে এসেও ৪৯৮এ ধারার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেটা যাতে ছাপা হয় তার জন্য সেই লেখক প্রতিদিন এসে পত্রিকা দপ্তরে বসে থাকতেন। কীভাবে যে মা দুর্গা আর শিবঠাকুর বেঁচে গিয়েছিলেন সেটা অফিসের সকলেই জানে।

একবার একজন এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন আর তিনিও চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। একটা চেয়ার টেবিল পেলে তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে ছয়ঘণ্টা এখানে বসে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখবেন। কিন্তু এর জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেবেন না।

কিন্তু এবারের ঘটনাটা অস্মিতা আর বইতে পারছে না। আগের দিন রাত এগারোটার সময় অচেনা নম্বর থেকে ফোন– আমি মিস্টার রায় বলছি।

–হ্যাঁ বলুন।

আমি একটা আত্মজীবনী লিখতে চাই।

–লিখুন, মানা করেছে কে।

–আপনাদের কাগজে লিখতে চাই। আমি বহুদিন ধরে বিভিন্ন কিংবদন্তির সঙ্গ করেছি। কাজেই আমি আত্মজীবনী খুব ভালোই লিখব গ্যারান্টি দিতে পারি।

–কিন্তু আমাদের কাগজে তো আত্মজীবনী লেখার কোনও বিভাগ নেই।

–কেন... সেলিব্রিটির আত্মজীবনী যে ছাপা হচ্ছে?

–আরে তিনি তো সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি লিখবেন না তো কে লিখবেন!

–কেন আমি লিখব। আমি তাঁকে চিনি। তাঁর সঙ্গও করেছি। আমার লেখা তাঁর থেকেও ভালো হতে বাধ্য। আপনাকে আমি লেখাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনার পছন্দ না হয় আমি অন্য ব্যবস্থা করব। ... ঘোষদা আছেন। তাঁকে বলব ছাপানোর জন্য। আমি তাঁর সঙ্গও করেছি। কাজেই তিনি ফেলবেন না আমাকে।

অস্মিতা ভাবছে, প্রিন্ট মিডিয়ার যা অবস্থা এই চাকরিটা ছেড়ে গেলে আর কি চাকরি পাবে!

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ যাঁরা সত্যিকারের লেখক এই লেখা তাঁদের পাঠের অযোগ্য। কোনওভাবে লেখকদের মানহানির জন্য এই লেখা একেবারেই নয়। কোনও লেখক দুঃখ পেলে বর্তমান লেখাটির লেখক ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু খবরের কাগজে কাজ করার দুঃখের খানিকটা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অক্ষম চেষ্টা মাত্র। সকলে নিজগুণে মার্জনা করবেন।

অঙ্কন ঃ অভি